সতীনাথ ভাদুড়ীর *চিত্রগুপ্তের ফাইল* : ব্যক্তি ও রাজনীতি

মাখন চন্দ্র রায়*

[সারসংক্ষেপ : সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬–১৯৬৫) একজন রাজনীতি সচেতন কথাশিল্পী। *জাগরী* (১৯৪৫) কিংবা *ঢোঁড়াই চরিতমানসের* (১৯৪৯–১৯৫১) মতো তাঁর তৃতীয় উপন্যাস *চিত্রগুপ্তের ফাইল*-এও (১৯৫৬) রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও আর্থ-সামাজিক-ব্যক্তিক টানাপোড়েনের চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। স্বীয় রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও জীবনদৃষ্টির গভীরতার সমন্বয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী ব্যক্তিজীবনে রাজনীতির প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন। সমকালীন রাজনীতির নানা বাস্তবতাকে এই উপন্যাসে যথার্থভাবে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ বিপুলভাবে সাধারণ মানুষের জীবনচেতনাকে বিবর্তিত করেছে। বৃহত্তর বিহারের এ রকম কতিপয় রাজনৈতিক কর্মীর অস্তিত্বের সংগ্রামই পরিস্ফুট হয়েছে *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসে। ব্যক্তিক ও সামাজিক অধিকার সচেতনতা ও সমকালীন অনিবার্যতায় বদলে যাওয়া জনজীবনে রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিঘাতের স্বরূপ অনুসন্ধানই এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।]

ভারতবর্ষের এক রাজনৈতিক ক্রান্তিকালের কথাশিল্পী সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬–১৯৬৫)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অব্যবহিত কালাবর্তে বিধ্বস্ত স্বদেশ, সংকটদীর্ণ সময় ও টালমাটাল রাজনৈতিক বাস্তবতার যুগে সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর দীপ্র আবির্ভাব। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী সতীনাথ ভাদুড়ী স্বাধীনতা উত্তরকালে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছিলেন সাহিত্যচর্চায়। আজীবন বিহারের পূর্ণিয়াবাসী এই লেখকের সৃষ্টিকর্মে অমর হয়ে আছে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ ও তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও জীবনাদর্শ। বঞ্চিত, অবজ্ঞাত ও প্রান্তিক জনপদের জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতার চিত্র-রূপায়ণে তিনি ছিলেন ঐকান্তিক। সমাজ-সচেতন লেখকের প্রায় সব রচনাই তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও দায়বদ্ধতার ফসল। রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ তাঁর সৃষ্টির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। সমকালীন বাস্তবতার সামগ্রিক প্রভাবে সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্যে সামাজিক অব্যবস্থার ভয়াল চিত্র, কলুষিত রাজনীতি, মধ্যবিত্তের জটিল মনোবৃত্তি প্রভৃতি অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। লেখার মধ্য দিয়ে নিরলসভাবে ভারতাত্মার সন্ধান করেছেন তিনি। জীবনসন্ধিৎসু এই লেখক দেশ-কাল-মানুষের স্বরূপ খুঁজতে গিয়ে এই সত্যে উপনীত হয়েছেন যে, 'মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে; পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে' (সতীনাথ, ২০১২ : ১১৩)। সাহিত্য সৃষ্টি তাঁর কাছে সচেতন শিল্পকর্ম। ফলে তাঁর প্রতিটি রচনাতেই গভীর নিরীক্ষা ও সুনিবিড় পর্যবেক্ষণের ছাপ থাকে। সমাজ-সংস্কারক না হয়েও সামাজিক অসঙ্গতি, মিথ্যাচার আর প্রচলিত সংস্কারকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন তিনি, তাঁর শানিত ব্যঙ্গের আবরণে স্বতন্ত্র স্বর ও ভাষ্যে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* (১৯৪৫) ও *ঢোড়াই চরিতমানসের* (১৯৪৯–১৯৫১) মতো *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসটিতেও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। *চিত্রগুপ্তের ফাইল* প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। উপন্যাসটি প্রথমে *চিত্রগুপ্তের ফাইল* নামে 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আরম্ভ করে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। কিন্তু পত্রিকাটি অল্পদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই পত্রিকায় উপন্যাসটির সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশ হতে পারেনি। পরে 'মাসিক বসুমতী'তে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র সংখ্যায় এবং ১৩৫৬-র বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশকালে উপন্যাসটির নাম পরিবর্তন করে 'মিনাকুমারী' নামটি সাব্যস্ত করা হয়। লেখক পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধেই সে সময় পত্রিকাতে প্রকাশকালে গ্রন্থটির নাম পরিবর্তনে সম্মত হয়েছিলেন। বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় অবশ্য তিনি উপন্যাসটির নিজের দেওয়া 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' নামটিই ব্যবহার করেন। এ সম্পর্কে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটক সতীনাথের ঘনিষ্ঠ 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে চিঠিতে লেখেন :

> সতীনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের *চিত্রগুপ্তের ফাইল* অগ্রহায়ণের মাসিকে শুরু হবে। সর্বাগ্রে প্রয়োজন এর একটি পরিবর্তিত নাম। আর প্রুফ দেখানোর সময় লেখককে অনুরোধ করবেন যেন প্রথম প্রকাশিত পরিচ্ছেদের ভাষা যৎকিঞ্চিৎ পালটে দেন। (স্বস্তি, ২০১০ : ৪৫)

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পটভূমিতে সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* ও *ঢোঁড়াই চরিতমানস* উপন্যাস দুটি রচিত। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসঙ্গ আসেনি। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলো গণ-আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার। *'চিত্রগুপ্তের ফাইল* শ্রমিক জনজীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত। উপন্যাসটির মূল সুর যুগের জনজাগরণেরই সুর' (ভবানী, ২০০৬ : ৩০৬)। এ উপন্যাসের চরিত্রগুলো তাৎমা-ধাঙরদের মতো বঞ্চিত বা পশ্চাৎপদ নয়, অভিজ্ঞতায় ও রাজনৈতিক দীক্ষায় তারা অনেকটাই প্রাগ্রসর। সতীনাথ ভাদুড়ীর অন্যান্য রচনার মতো *চিত্রগুপ্তের ফাইল*ও বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রচিত। উপন্যাসের চরিত্র অভিমন্যু, শিউচন্দ্রিকা প্রভৃতি রাজনৈতিক চরিত্র। এ উপন্যাসে সতীনাথের শ্রমিক জীবনের সঙ্গে সাহচর্যের অভিজ্ঞতা প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসকে ঘিরে স্বার্থান্বেষী কপট দেশসেবকদের ভিড় দেখে বিব্রত হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ী। চিত্রগুপ্তের ফাইল উপন্যাসটিতে সেই সময়ের চালচিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। স্বাধীনতার পর সাধারণ মানুষের প্রবঞ্চিত হওয়া দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। চার মাস কোনো দলে যোগ না দিয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষক-শ্রমিক সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির বাসনা নিয়ে তিনি যোগ দেন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে। 'এ উপন্যাসে যে ট্রেড ইউনিয়নের ছবি পাওয়া যায় তা ১৯৪৮-এর বিহার কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত' (স্বস্তি, ২০১০ : ৪৫)। তিনি ভেবেছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যেই রয়েছে সমাজের উন্নতির হাতিয়ার। ধারণা করা যায় গণ-অভ্যুত্থানের আদর্শ লেখকের মনে সে সময় রাশিয়া ভ্রমণের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিহারের 'কাটিহার জুটমিল'-এর শ্রমিক মালিকের বিরোধে অংশগ্রহণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই উপন্যাসটিতে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। ধর্মঘটের সময় মালিকপক্ষের হীন চক্রান্ত, শ্রমিক কল্যাণের নামে মুনাফালোভী কর্তৃপক্ষের শ্রমিকশোষণ প্রভৃতি তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন লেখক। শ্রমিক শ্রেণির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে ঘটনার বিশ্লেষণধর্মী নিপুণ বর্ণনা, প্রতিটি ঘটনার কার্যকারণ সন্ধানের মাধ্যমে বাস্তবের সুসংহত বিন্যাসে তিনি রচনা করেছেন *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসটি। কারণ রাজনীতি-সচেতন সতীনাথ ভাদুড়ী বিশ্বাস করতেন আধিয়ার-শ্রমিক ঘনিষ্ঠতাই গণজাগরণ ঘটাবে। শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো, মর্যাদার সঙ্গে তাদের

কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক আন্দোলন দমনে শোষক মালিক শ্রেণির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র প্রভৃতি উত্তেজক উপাদান নিয়ে *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। উপন্যাসটির কাহিনিকাল যদিও স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েক বছর পূর্ব থেকে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পরদিন পর্যন্ত বিস্তৃত, তথাপি এই উপন্যাসের আবেদন চিরকালীন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সকল উপন্যাসেই পরিবেশন-কৌশলে অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাস রচনার প্রচলিত ভাবনার বৃত্ত ভেঙে তিনি নির্মাণ করেন নতুন নতুন আখ্যান। *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসটিও আরম্ভ হয় আকস্মিক এক পৌরাণিক আবহের অবতারণায় :

> তাঁর দপ্তরের আত্মহত্যা বিভাগ থেকে জরুরি ফাইল টেনে নিয়ে বসেন চিত্রগুপ্ত, মিনাকুমারীর ঘটনাবহুল জীবনের ফাইল। আত্মহত্যায় মরতে হবে মিনাকুমারীকে– এ তাঁর প্রাথমিক নির্দেশ। তার জীবনের নাট্য আরম্ভ হওয়ার আগেই এই অমোঘ নির্দেশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এর আর নড়চড় হওয়ার জো নেই। মিনাকুমারীদের জীবনের পুতুলনাচের সুতোটা তাঁর হাতে। চিত্রগুপ্তের নির্লিপ্ত চোখে মানুষগুলো তাঁর নির্দেশ পূরণ করবার উপকরণ– রক্ত-মাংসে গড়া, সুখে-দুঃখে ভরা মানুষ। লোকে ভাবছে যে ঘটনাচক্রই জীবনের কাহিনি গড়ে তুলছে; বুঝছে না যে এ চাকা ঘোরাচ্ছেন চিত্রগুপ্ত। পুতুলের উপর মিনা করেন কারিগর; আর জীবনের উপর মিনা করেন তিনি। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৫৯)

এই চিত্রগুপ্ত হিন্দুবিশ্বাস মতে পরলোকে যমরাজের সচিব মনে করে সূচনার দুটি পরিচ্ছেদ পড়ে ধাঁধায় পড়ে যায় পাঠক। চরিত্রটি অবতারণার তাৎপর্য নিয়ে সংশয় জাগতেই পারে। কিন্তু লেখক এ ব্যাপারে বেশিদূর অগ্রসর না হয়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করেন।

চিত্রগুপ্তের ফাইল উপন্যাসের পটভূমি বিহারের মফস্বল শহর বলীরামপুর ও শিরনিয়া। বলীরামপুর জুটমিলের শ্রমিক ইউনিয়ন-এর সেক্রেটারি শিউচন্দ্রিকা এবং তার অন্তরঙ্গ সহকর্মী অভিমন্যু এই উপন্যাসের প্রধান দুই পুরুষ চরিত্র। শিউচন্দ্রিকা এই শ্রমিক সংগঠন তৈরির পূর্বে আরও দু-একজন রাজনৈতিক কর্মী শ্রমিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন তৈরি করেছিল। শ্রমিকদের ঠকিয়ে অর্থ আত্মসাতের হীন উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এই সংগঠনগুলোর নেতারা কাজ হাসিলের পর সরে পড়ে। এইসব কারণে শ্রমিকদের মজদুর ইউনিয়নের নেতাদের উপর আস্থা ছিল না। শিউচন্দ্রিকার আগে শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারি ছিল প্রথমে ইসরাইল মিয়া ও তারপর আমীরচন্দ। কিন্তু মজুররা তাদের কারও উপরেই শেষ পর্যন্ত আস্থা রাখতে পারেনি। শিউচন্দ্রিকা শক্ত হাতে ইউনিয়নের হাল ধরে সুশৃঙ্খল কর্মপদ্ধতি ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে শ্রমিকদের আস্থা অর্জন করে। লেখকের বর্ণনায় :

> রাজনীতি আর পার্টির কাজই শিউচন্দ্রিকার জীবন; আর কিছু সে জানে না; অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোকেও সে একটা অনাবশ্যক বিলসিতা মনে করে। এই একমুখী চিন্তা তার সারা জীবনকে চালিত করে নিয়ে বেড়ায়। যে কোনো প্রশ্ন তার সম্মুখে আসুক, সে তার পার্টির সুবিধা-অসুবিধার মাপকাঠি দিয়ে সেটাকে মাপবে। অদ্ভুত তার কর্ম-প্রেরণা, আশ্চর্য তার নিষ্ঠা। তার কর্মজীবনের সম্মুখে যে কোনো বাধাই আসুক তাকে আটকাতে পারবে না। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৬৪)

যুক্তিবাদী শিউচন্দ্রিকার সকল চিন্তা-চেতনা পার্টির ভালো-মন্দের বিবেচনায় কেন্দ্রীভূত। পূর্ববর্তী নেতাদের অপকর্মের বিষয়ের দিকে লক্ষ রেখেই সে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেত। কর্মনিষ্ঠ এই শ্রমিক নেতার মধ্যে কেউ কোনোদিন ভাবাবেগ লক্ষ করেনি, পার্টিই তার জীবনের

ধ্যানজ্ঞান ছিল। সাহেব মালিকদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলা ও শ্রমিক আইনের সমস্ত খুঁটিনাটি সময় মতো তুলে ধরার জন্য শিউচন্দ্রিকার নেতৃত্ব সম্পর্কে কারো দ্বিধা ছিল না। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই শিউচন্দ্রিকার মতো একজন যথার্থ রাজনৈতিক কর্মীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী।

শিউচন্দ্রিকার ঠিক বিপরীত চরিত্র ছিল অভিমন্যু। কৈশোরের ভাবপ্রবণ মনে উদ্বেলিত হয়ে রোমাঞ্চকর রাজনীতির স্বপ্ন-উন্মাদনায় রাজনৈতিক জীবনকে সে বেছে নিয়েছিল। এই উন্মাদনা একদিন কেটে গেলেও গতানুগতিকতার চাপে ও কর্মী-বন্ধুদের সান্নিধ্য হারাবার ভয়ে শেষ পর্যন্ত সে রাজনীতি ত্যাগ করতে পারেনি। তার স্বভাব হালকা প্রকৃতির। কোনো জিনিস তলিয়ে দেখার মতো তার ধৈর্য ছিল না। শিউচন্দ্রিকার মতো নিয়মের বাঁধা জালে আবদ্ধ থাকলে অভিমন্যু হাঁপিয়ে উঠতো। তবে অভিমন্যুর উপর শিউচন্দ্রিকার কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আত্মভোলা প্রকৃতির জন্য পার্টির অন্যান্য সদস্যরা অভিমন্যুকে ভালোবাসত। স্বভাবতই লঘুচিত্ত অভিমন্যু সব কিছুকেই হেসে উড়িয়ে দিতে চাইত। ঔপন্যাসিক তার স্বভাবকে বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> যাচ্ছে-যেতে-দাও গোছের শান্ত মন্থর জীবনে, মধ্যে মধ্যে দু'কূল-ভাঙা প্লাবন আসবে, আর সেই সময় বানের মুখে গা এলিয়ে দেবে দ্বিধাহীন মনে, এই রকম জীবনই তার খেয়ালের সঙ্গে খাপ খায়। তার ভাবপ্রবণতার মধ্যে কৃত্রিমতার ভেজাল নেই; যে ভাবের বন্যায় সে যখন ভাসে, তখন তা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করে না। জীবনের উপর তার মায়া নেই, সারা জগৎকে সে বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে– কাল কী হবে সে কথা নিয়ে আজ মাথা ঘামাতে চায় না। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৬৫)

স্বভাবের পার্থক্য সত্ত্বেও বয়ঃকনিষ্ঠ অভিমন্যু শিউচন্দ্রিকার সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ বন্ধু হবার মর্যাদা পেয়েছে। কারণ সে জানে অভিমন্যুর মতো এত সাবলীলভাবে আর কেউ কারখানার মজুরদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না। শুধু প্রকৃতিতে নয়, আকৃতিতেও দুই বন্ধুর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। অভিমন্যু ঋজু অথচ নমনীয়, ছয় ফুট লম্বা এবং সুন্দর মুখশ্রীর জন্য সে সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। একজন মজুরের তিনটি আঙুল কেটে যাওয়ায় ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে শিউচন্দ্রিকা অভিমন্যুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। নতুন ম্যানেজার ম্যাকলীন সাহেব শিউচন্দ্রিকাকে উপেক্ষা করে সুদর্শন অভিমন্যুকেই ইউনিয়নের সেক্রেটারি মনে করে। অবশ্য সাহেবের ভুল ভাঙতে দেরি হয় না। শিউচন্দ্রিকার চেহারা যেমনই হোক তার ইস্পাত-কঠিন চরিত্র উপলব্ধি করতে সাহেব দেরি করেনি। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আঙুল দিয়ে মেপে কী করে ঠিক হয়– আইনের সূক্ষ্ম মারপ্যাচগুলি অভিমন্যু বুঝতে পারে না। তবে সংসারে উদাসীন ভাব থাকলেও জীবনের প্রতি তার আসক্তি ছিল। দুজনের ব্যক্তিত্বের ধরন আলাদা, কিন্তু মৌল স্বভাবে দুইজনই সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ। শ্রমিকরা উভয়কেই বিশ্বাস করে। শিউচন্দ্রিকার জন্য তাদের মনে রয়েছে অসীম শ্রদ্ধা– হয়তো সে তার গাম্ভীর্যের কারণে। অন্যদিকে অভিমন্যুর প্রতি তাদের প্রাণভরা ভালোবাসা। কারণ অভিমন্যু তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে পারে অনায়াসে :

> অভিমন্যুকে মজুররা যত আপন বলে ভাবতে পারে, শিউচন্দ্রিকার বেলায় তা পারে না। শিউচন্দ্রিকা মজুরদের অন্তর থেকে ভালবাসে, তাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু একটা

> মজুরের সঙ্গে গলা-জড়াজড়ি করে নিছক মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে যাক তো? সে পারে অভিমন্যু। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৬৭)

সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসসমূহে ভারতবর্ষের রাজনীতির উপর মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব সুচিহ্নিত করেছেন। *জাগরী* উপন্যাসে চারটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিবারের উপর গান্ধীজির আদর্শের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। বিহারের অনগ্রসর জনপদে গান্ধীজি কীভাবে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তার বাস্তবোচিত বিবরণ পাওয়া যায় *ঢোঁড়াই চরিতমানস* উপন্যাসে। আর *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসে শ্রমজীবী মানুষের আধুনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অধিকার সচেতন হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত রয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্র যে ভাবপ্রবণ মানুষের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয় তা এই তিন উপন্যাসের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করলেও *জাগরী*র বিলু, *ঢোঁড়াই চরিতমানসে*র ঢোঁড়াই এবং *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসের অভিমন্যুর মানসিক গঠন অভিন্ন উপাদানে নির্মিত। ঔপন্যাসিক এই চরিত্রগুলোকে আদর্শবাদের ভারবাহী যন্ত্রে পরিণত না করে জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসটি মূলত শ্রমিক সংগঠনের উপর ভিত্তি করে রচিত হলেও ঔপন্যাসিক স্বাধীন ভারতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কটিও নিখুঁতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। শ্রমিক-মালিক বিরোধের পাশাপাশি অভিমন্যু ও মিনাকুমারীর মৌন প্রেমের আখ্যানটি কাহিনিতে স্নিগ্ধ করুণ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। মিলের অদূরে অনাথালয়ে হতভাগ্য অনেক শিশুর সঙ্গে মিনাকুমারী ও রুকণী বড়ো হয়েছে। মিল কর্তৃপক্ষই অনাথালয় পরিচালনা করত। রুকণীর সঙ্গে মিলের সহকারী ম্যানেজার জয়নারায়ণের একটা গোপন সম্পর্কের কথা অনাথালয়ের অনেকে জানে। 'কেসরপাক' নামের এক ধরনের মিষ্টির কারবার নিয়ে অনাথালয়ে যাতায়াতের সুবাদে মিনাকুমারীর সঙ্গে অভিমন্যুর পরিচয় হয়। রুকণী অনাথালয়ের ছেলেমেয়েদের রান্না-খাওয়ার তদারক করে, আর মিনাকুমারী হিসাব-নিকাশ তত্ত্বাবধান করে। অনাথালয়ের মেয়েদের চাল চলন সম্পর্কে স্থানীয় লোকজনের ভালো ধারণা ছিল না :

> অনাথালয়টাকে অধিকাংশ মজুর প্রায় গণিকালয় বলেই ভাবে। তাও আবার যে-সে ধরনের নয়– এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার চালায়, ম্যানেজার আর হাকিমদের জন্য; মিলের অন্যান্য বড় চাকুরেরাও পাতকুড়ুনো এঁটোটা-কাঁটাটা পায়।... দেখিস না, মিলের ভিতর কোয়ার্টার করে দিয়েছে। কেন বাপু, অনাথালয় খুলেছ, বর জুটিয়ে দাও মেয়েদের, বিয়ে দিয়ে দাও যেখানে পারো। তা নয়! ... আর লক্ষ্য করেছিস ঐ পটের বিবি দুজনের রোজ মিল থেকে অনাথালয় যাওয়া চাই– সন্ধ্যার পর।... (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৭৭)

শ্রমিক ইউনিয়নের চরম আর্থিক দুরবস্থার দিনে অভিমন্যুর মাথায় এক বুদ্ধি এসেছিল। সে তার বৈদ্য কাকার কাছ থেকে 'কেসরপাক' তৈরি করতে শিখেছিল। চিনি বা গুড়, চিনাবাদামের কুচি, ছোলার বেসন, কর্পুর, ছোটো এলাচ, খয়ের ও কিছু শিকড় বা ছাল দিয়ে তৈরি হালুয়ার মতো এই পদার্থের শক্তি বর্ধক হিসেবে খ্যাতি ছিল। অভিমন্যু সেই কেসরপাক তৈরি আরম্ভ করেছিল ইউনিয়ন অফিসের উঠোনে। এগুলো সে দিয়ে আসতো স্থানীয় অনাথালয়ে। সেখান থেকে ছেলেরা এগুলো ফেরি করে বেচতো রেলগাড়িতে। আর এই আয় থেকে খানিকটা অনাথালয়কে কমিশন দিয়ে বাকিটা জমা হতো ইউনিয়নের খাতায়। চাঁদা বা অন্য সূত্রে তেমন কোনো আয় না থাকায় এভাবে ইউনিয়নের জন্য বাধ্য

হয়েই অর্থ সংগ্রহ করতে হতো। কেসরপাকের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব মিনাকুমারীর ওপর ন্যস্ত ছিল। এই সূত্রেই অভিমন্যুর সঙ্গে মিনাকুমারীর পরিচয়। এই পরিচয় আরও নিবিড় হয় যখন মিলের ক্যান্টিনের হিসাব রাখার কাজে মিনাকুমারী এবং রুকণী নিযুক্ত হয়। বাস্তববাদী মানুষ শিউচন্দ্রিকা শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত থেকে তাদের মনস্তত্ত্ব সহজেই অনুধাবন করতে পারত। এই কারণে অনাথালয়ের মেয়ে মানুষদের সঙ্গে মিলের কোন সম্পর্ক থাকুক তা সে চাইত না। স্বচ্ছন্দ স্বভাবের জন্যই অভিমন্যু ও মিনাকুমারী সহজ আবেগে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়। মিনাকুমারী অভিমন্যুর সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। মিনাকুমারী অনাথালয়ের পুরনো খাতা থেকে জেনেছে সে আসলে জন্ম-পরিত্যক্তা। বলীরামপুর জংশন স্টেশনের প্লাটফর্ম থেকে তার আশ্রয় হয়েছিল এই অনাথালয়ে। কেউ কখনও তার খোঁজ নিতে আসেনি। অন্য অনেকের বিয়ে হয়ে গেলেও রুকণী বা মিনাকুমারীর বিয়ের উদ্যোগ নেয়নি কেউ। কারণ অনাথালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট জয়নারায়ণ প্রসাদ জানে তারা দুই জন চলে গেলে অনাথালয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলবে না। এর ফলে মিনাকুমারীর অনুধাবন নিম্নরূপ :

> বড় হওয়ার পর মিনাকুমারী প্রতিদিন অনুভব করেছে যে অনাথালয়ে থাকলে পরিচয় হয় জগতের আঁধার আর উষর পিঠটার সঙ্গে। স্নেহ-ভালবাসা, আদর-আবদার এসবের জায়গা কোথায় এখনাকার আবহাওয়ায়? স্বার্থের রুক্ষতার ছোঁয়াচ লেগে সব শুকিয়ে যায় এখানে। নিজের মা-বাবা যে মেয়েদের ভালবাসতে ভুলেছে, তাদের মনের স্নেহ পাওয়ার জায়গাটুকু থেকে যায় একেবারে খালি। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৭৯)

এই শূন্যতাবোধ থেকে বাঁচতে চেয়েছিল মিনাকুমারী। তার বুভুক্ষু মন এমন এক জীবনসঙ্গী চায় যার কাছ থেকে সে গভীর ভালোবাসা পাবে– 'এত গভীর যে তার রুক্ষ বাল্য-জীবনের সব বাকী-বকেয়া উসুল করে নেওয়ার পরও যেন পুজিতে হাত না পড়ে' (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৮০)। মিনাকুমারী আকাঙ্ক্ষা করেছিল একটা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। বাস্তব অভিজ্ঞতার কাঠিন্যই তাকে হিসেবি হতে শিখিয়েছিল। ভাবের আবেগে নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে হিসেব কষে অত্যন্ত সন্তর্পণে পা ফেলতে অভ্যস্ত ছিল মিনাকুমারী। এরই মধ্যে তার জীবনে আসে আত্মভোলা অভিমন্যু। যে লোকটির অকৃত্রিম সৌজন্য দেখে মিনাকুমারী মুগ্ধ হয়েছিল, ক্রমেই সে দেখল যে মোটেই সে উদাসীন স্বভাবের নয়– সব ব্যাপারেই উৎসাহী, আচার-আচরণে ভদ্র। মিনাকুমারী অচিরেই বুঝতে পারে অভিমন্যুকে কেবল দূর থেকে ভালো লাগে না, কাছ থেকেও ভালো লাগে। অভিমন্যুও দ্রুত জড়িয়ে পড়ে সম্পর্কের জালে। মিনাকুমারীকে বিবাহ করার ব্যাপারে অভিমন্যুরও ছিল প্রবল আগ্রহ। এ বিষয়ে লেখকের বিশ্লেষণ :

> এই ভাল লাগালাগির পথে, অন্য লোক যেখানে হেঁটে চলে, অভিমন্যু সেখানে ছুটে চলে, চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পক্ষীরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে যে রাজপুত্তুর মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলে, তার কি মাটিতে হোঁচট খাওয়ার কথা মনে আসে? মনের নদীতে বান ডেকেছে; দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যাবেই যাবে। তাতে বাধা দেবার কে মনের রাজ্যের বাইরের লোকেরা? আর বাইরের লোকরা এ নিয়ে মাথা ঘামায়ও নি। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৮১)

মিনাকুমারী অভিমন্যুকে একান্ত করে পেতে চায়। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মী অভিমন্যুর অনিশ্চিত জীবনে প্রবেশ করতে তার কিছুটা দ্বিধা ছিল। সতীনাথ ভাদুড়ী মিনাকুমারী চরিত্রটি বাস্তবোচিত ভাবে রূপায়ণ করেছেন। মিনাকুমারী নিরুদ্বেগ সাধারণ জীবন চায়। অনাথালয়ে পালিতা

মিনাকুমারী অভিমন্যুর মতো একজন সন্ন্যাসী প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে কেবল আবেগের বশে সংসারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। কারণ থানা-পুলিশ, অভাব-অনটন, অনিশ্চয়তা রাজনৈতিক কর্মীদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। গার্হস্থ্য জীবনের জন্য অভিমন্যু রাজনীতি ত্যাগ করবে তারও নিশ্চয়তা নেই। হিসেবী মিনাকুমারী অভিমন্যুর কাছ থেকে তার বিষয়ে সবকিছু খুঁটিয়ে জেনে নিতে চায়। অভিমন্যুর সংসারে থাকার মতো আছে এক কাকা-কাকীমা, তাও রাজনীতি করার জন্য কাকা-কাকীমা তার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখেনি। রাজনীতি ত্যাগ করে অভিমন্যু যে অন্য কোন চাকরি করবে এ ধারণা করাও ভুল। তাই এভাবে জীবনকে বেঁধে ফেলার মধ্যে বিপদের ঝুঁকি থেকে যায়। তবু অভিমন্যুকে পাবার লোভটাও তার কাছে কম নয়। এই দোটানার মধ্য দিয়েই মিনাকুমারী অভিমন্যুর খুব কাছেই এসে পড়েছিল। শিউচন্দ্রিকা শ্রমিক সংগঠন নিয়েই ব্যস্ত। বহু পরিশ্রমের পর ইউনিয়নের শক্তি বাড়তেই সে অনাথালয়ের সঙ্গে 'কেসরপাকে'র পাট চুকিয়ে দিয়েছে। কেসরপাক বিক্রির মাধ্যমে টাকা তোলার ব্যাপারটা সে কোন দিনই খুব একটা পছন্দ করেনি। তবু আয়ের কথা ভেবেই সে জয়নারায়ণ প্রসাদের কেসরপাক সংক্রান্ত খোঁচাও একসময় সহ্য করেছিল। এই নির্দেশে অবধারিত ভাবেই মুষড়ে পড়ে অভিমন্যু। কারণ কেশরপাকের কল্যাণেই মিনাকুমারীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমেই তার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল নিবিড় মধুর সম্বন্ধ। স্বাভাবিকভাবেই মিনাকুমারীও এ খবরে মনে মনে ক্ষুণ্ন হয়। এরপর তারা পরস্পরের খবরাখবর নিতে থাকে ক্রেশের দাই রহমন বিবির মাধ্যমে। মিল থেকে অনাথালয়ের দূরত্ব মাইল দুয়েক। মাঝখানে পথের দুইধারে ঝোপঝাড় জঙ্গল ও দীক্ষিতদের আমবাগান। অনাথালয়ে যাবার পথে সেই আমবাগানে পায়ে হেটে এসে অভিমন্যুর সঙ্গে এক সন্ধ্যায় দেখা করবে– এই মর্মে রহমত বিবির মাধ্যমে এক চিঠি পাঠায় মিনাকুমারী। অনেক দিনের ব্যবধানে দেখা হয় দুই জনের। এই দিনগুলিতে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে মিনাকুমারী অনেক ভেবেছে। পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা অনিশ্চয়তার কথা ভেবেও অভিমন্যুর প্রতি তার নিগূঢ় আকর্ষণকে কোনো মতেই সে উপেক্ষা করতে পারেনি। সেদিনটার বর্ণনায় লেখক আশ্চর্য সূক্ষ্ম এক পরিমণ্ডল নির্মাণ করেছেন :

> সারা জগৎ আজ বেহিসাবী হয়ে উঠেছে। দীক্ষিতদের আমবাগানে আমের মুকুলের হিসাব নেই, মৌমাছির গুঞ্জনের বিরাম নেই, পশ্চিমের বাতাসে পাতা-ঝড়ার শেষ নেই। আজকের দিনে মিনাকুমারী নিজের ভাণ্ডার উজাড় করে বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করবে না। কিন্তু কেবল আজকের দিনটার জন্য, আঁধারের কাছ থেকে চুরি করা এই সময়টুকুর জন্য।
>
> এক ঝাঁক ফড়িং এর মতো ছোট-ছোট পোকা ফড়-ফড় করে উড়ে তাদের জ্বালাতন করে মারল। সত্যিকার বেহিসাবী অভিমন্যুর উষ্ণ নিশ্বাস লাগছে হিসেব করা বেহিসেবী মিনাকুমারীর সিঁথির চুলে। আমের মুকুল থেকে দুজনের দেহে টপ-টপ করে মধু-ঝরার বিরাম নেই। দুটি দেহের দুয়ারে রসের ফোঁটার টোকা পড়ছে, কিসের যেন সংকেত করে। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৮৫)

অভিমন্যু ও মিনাকুমারীর ব্যক্তিগত গোপন সম্পর্ক এক দিকে যখন নিবিড় হয়ে উঠেছে, অন্য দিকে কারখানার পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হতে শুরু করে। মজুরি বৃদ্ধির দাবি, ক্যান্টিনে অব্যবস্থার প্রতিকার, ক্রেশের খাদ্য নিয়ে দুর্নীতির তদন্তের দাবি– এইসব নিয়ে পরিস্থিতি দিন দিন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নের পাশাপাশি গজিয়ে ওঠে মালিক পক্ষের মদদে তৈরি রামভরোসা সর্দারের নতুন ইউনিয়ন। ভাড়া না দেওয়ার অভিযোগে মিলের ব্যারাক থেকে কয়েকটি মজুর পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। শিউচন্দ্রিকাও

নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকে না। মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ধনিরামকে দিয়ে মামলা রুজু করে। মজুরদের উপর জুলুমের প্রতিবাদে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম যায় পাটনায়। ধর্মঘটের চরমপত্র পাঠানো হয় লেবার কমিশনারের কাছে। শিউচন্দ্রিকা নিজে পাটনায় গিয়ে শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলে, তিনি তার দরখাস্ত লেবার কমিশনারকে পাঠিয়ে দিয়ে দ্রুত বলীরামপুর যেতে নির্দেশ দেন। লেবার কমিশনার দুই পক্ষকেই বৈঠকে ডাকেন ডাক বাংলোতে। শিউচন্দ্রিকা রীতিমতো প্রস্তুত হয়ে অভিমন্যুকে সঙ্গে নিয়ে কমিশনার সাহেব, ডি.এস.পি, এস.ডি.ও, জয়নারায়ণ প্রসাদ ও ম্যাকলীন সাহেবের মুখোমুখি হয়। কথাবার্তা শুরু হলে শিউচন্দ্রিকা যে সব অকাট্য যুক্তি-তথ্য পেশ করতে থাকে তাদের দাবির সপক্ষে, তাতে মিল কর্তৃপক্ষ পিছু হটতে থাকে। জয়নারায়ণ শিউচন্দ্রিকা ও অভিমন্যুর বিরুদ্ধে নানা কটূক্তি করলে সমবেত মজুররা তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে। কর্তৃপক্ষ ও ইউনিয়নের দর-কষাকষির কলহোন্মুখ পরিবেশে হঠাৎ করে জয়নারায়ণ প্রসাদ তার ট্রাউজারের পকেট থেকে নাটকীয় ভাবে একখানা চিঠি বের করে লেবার কমিশনারে হাতে তুলে দেয়। 'ত্যাগী সন্ন্যাসীদের নৈতিক চরিত্রের একখানা প্রমাণপত্র দেখুন'– বলে মিনাকুমারীকে লেখা অভিমন্যুর চিঠিটি ইউনিয়নের লড়াইকে জয়ের উপান্তে এনে ভেস্তে দেওয়ার জন্য ব্রহ্মাস্ত্রের মতো কাজে লাগায় জয়নারায়ণ প্রসাদ। চিঠিতে লেখা ছিল :

> মিনা,
>
> তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা করবে না একদিনও? তুমি এমন কেন? সব কাজের মধ্যেও চব্বিশ ঘণ্টাই তোমার কথা মনে হয়। লক্ষ্মীটি, আমার মনের অবস্থা বুঝে দেরি কোরো না।
>
> তোমারই
> অভিমন্যু
> ১৩–৬–৪৭
> (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৮৬)

মিনাকুমারীর প্রতি অভিমন্যুর দুর্বলতা এবং রুকণীর ঈর্ষাকে কার্য উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে মিল কর্তৃপক্ষ। মিনাকুমারীকে লেখা চিঠিখানা অভিমন্যু দিয়েছিল রহমতের বিবির হাতেই। কিন্তু টাকার খেলায় চিঠিখানা মিনাকুমারীর হাতে না পড়ে, পড়ে রুকণীর হাতে। অর্থের লালসা, মিনাকুমারীর প্রতি ঈর্ষা ও অভিমন্যুর প্রতি প্রতিশোধ-স্পৃহা থেকে রুকণী অভিমন্যুর সেই চিঠি জয়নারায়ণ প্রকাশের হাতে তুলে দিয়েছিল। এই চিঠির বিষয়ে মিনাকুমারী একেবারেই জানতে পারে না। মালিক-মজুরের সভায় শিউচন্দ্রিকার অকাট্য যুক্তিতে নাজেহাল যখন মিল কর্তৃপক্ষ, তখন জয়নারায়ণ অভিমন্যুর চরিত্র হননে এই চিঠির অব্যর্থ প্রয়োগ করে শ্রমিক নেতাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে শ্রমিকদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। শিউচন্দ্রিকা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে সভা থেকে বেরিয়ে আসে। অভিমন্যু ইচ্ছা করলেই তাকে লেখা মিনাকুমারীর চিঠিখানা সভার মধ্যে দেখিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারতো; কিন্তু জনসমক্ষে মিনাকুমারীর প্রসঙ্গ এনে সে তার ভালোবাসার অমর্যাদা করতে চায়নি। মিনাকুমারীকে লেখা চিঠি কী করে কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে পারে, মিনাকুমারী তার সঙ্গে কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? অন্তরে অভিমান নিয়ে সে এসব কথা ভেবেছে। বাইরে অপেক্ষমাণ মজুর জনতা বিচলিত হয়। তারা ভাবে অভিমন্যুর জন্য আজ তাদের জয়ের সুযোগ হাত ছাড়া হয়েছে। অভিমন্যুর এই অপরিণামদর্শিতায় শিউচন্দ্রিকা-অভিমন্যুর সম্পর্কেও কিছুটা চিড় ধরে। সে চায়

অভিমন্যুকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করতে, কিন্তু পার্টির অন্যান্য সদস্যদের অনুরোধে অভিমন্যুকে মজদুর ফ্রন্ট থেকে কিষাণ ফ্রন্টে বদলি করা হয়। তাকে পার্টির পক্ষ থেকে সংগঠিত 'বকাশ্‌ৎ' আন্দোলন চালানোর জন্য শিরনিয়া গ্রামে পাঠানো হয়।

অভিমন্যু সমস্ত কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে নীরবেই চলে যায় মঘৈলী থানার অন্তর্গত শিরনিয়ায়। সতীনাথ ভাদুড়ী যখন *চিত্রগুপ্তের ফাইল* রচনা করেছিলেন তখন তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন ভারতের মোহ অনেকটাই কেটে গিয়েছিল। শাসকের পরিবর্তনে শোষণের কোন রূপই বদলায়নি, কৃষক-শ্রমিকদের অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে গেছে। ঔপন্যাসিক সতীনাথ অভিমন্যু ও শিউচন্দ্রিকার মতো ঐকান্তিক শ্রমিক কর্মীদেরও নানা চক্রান্তের বলি হতে দেখেছেন। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে দুর্নীতি ও শোষণের আসল চেহারা প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন প্রকৃত শিল্পী। জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে তিনি চরিত্রগুলোকে অঙ্কন করেছিলেন। তাই পরিবেশ-নিরপেক্ষভাবে সৃষ্ট চরিত্রগুলো জীবনধর্মী হয়ে উঠেছে। ভারত স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু শিরনিয়ায় জমিদার অযোধিয়া চৌধুরীর অবাধ দাপট। ধান কাটার মরশুমে রায়তদের বঞ্চিত করে পুরো ধান তুলে নিতে চাইলে অভিমন্যুর নেতৃত্বে রায়তরা সংঘবদ্ধ হয়ে বাধা দেয়। পুলিশ ও জমিদারের লেঠেলদের সঙ্গে রায়তদের সংঘর্ষে অভিমন্যু মারাত্মকভাবে জখম হয়। তার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি হয়। রাতারাতি তাকে গরুর গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয় বলীরামপুর মজদুর ইউনিয়ন অফিসে। ভালো চিকিৎসার আশায় শিউচন্দ্রিকার আশ্রয়ে বলিরামপুর নিয়ে আসলেও শিউচন্দ্রিকা আহত ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত অভিমন্যুর চিকিৎসার খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পুলিশের ভয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রাণপণে অভিমন্যুর সেবা করে যায় শিউচন্দ্রিকা। ফেরারি আসামী অভিমন্যুকে দেখতে আসতে ডাক্তার প্রথমে আসতে রাজি হয় না। পরে এলেও অভিমন্যুকে শেষ রক্ষা করা যায় না। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ শোনার আকস্মিক আঘাতে অভিমন্যু যথেষ্ট মর্মাহত হয়। মহাত্মাজীর মৃত্যুতে শোক মিছিলে তার প্রেমিকা মিনাকুমারীকে দেখে উত্তেজনার শিখরে উপনীত অভিমন্যু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পরের দিন– ১৯৪৮ সালের একত্রিশে জানুয়ারি 'বলীরামপুর জুট মিলে'র শ্রমিক নেতা অভিমন্যুর শ্মশানে সৎকারের দৃশ্য দিয়েই উপন্যাসটি শুরু হয়েছিল। শীতের সেই সন্ধ্যায় তার চিতাকে ঘিরে বসেছিল মেয়েদের দল– মিনাকুমারী, রুকণী, বলীরামপুরের আরও অনেক মজুরনী। এই মুহূর্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

> পৃথিবীসুদ্ধ লোক আজ নিজেকে দোষী মনে করছে। দোষী মনে করছে নিজেকে ম্যাকলীন সাহেব, দোষী মনে করছে নিজেকে শিউচন্দ্রিকা, দোষী মনে করছে নিজেকে মিনাকুমারী; দোষী মনে করছে নিজেদের রুকণী, রহমতের বিবি, সরযূ সিং, প্রতিটি মজুর-মজুরনী, এমনকি মিলের এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ পর্যন্ত। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৬০)

শিউচন্দ্রিকা শ্মশানে সঙ্গে করে এনেছিল অভিমন্যুর সর্বক্ষণের সঙ্গী 'খদ্দরের আধছেঁড়া আধময়লা একখানা ঝোলা'। তারই মধ্যে সে পেয়ে যায় অভিমন্যুর কোষ্ঠী বিচার– কাশী থেকে করিয়ে আনা ভৃগুর গণনার নকল। আর একখানি চিঠি– অভিমন্যুকে লেখা মিনাকুমারীর চিঠি। শিউচন্দ্রিকা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি কোনো দিন সযত্নে ভাঁজ করে তুলে রাখা এই চিঠির কথা। আর ভৃগুর গণনায় অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ছিল এই কটি কথা– 'জাতকের কর্মের সহিত জনসাধারণের সম্বন্ধ থাকিবে; জাতক সাধারণত আনন্দপ্রিয়, নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ

হইতে পারেন... ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে মহারিস্ট...' (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৬২)। অভিমন্যুর চিতার আগুনে মিনাকুমারীর সেই চিঠি পড়ে শিউচন্দ্রিকার কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেল। সরকারি আদেশে শিউচন্দ্রিকাকে বলীরামপুর ছাড়তে হয় অভিমন্যুকে দাহ করার পরদিন। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যুতে শোকাভিভূত শিউচন্দ্রিকা তার যুক্তি ও মননের বাঁধা পথে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। অত্যন্ত বিচলিত চিত্তে অভিমন্যুর শেষ স্মৃতিচিহ্ন ঝোলা আর মিনাকুমারীকে অভিযুক্ত করে একটি চিঠি লিখে মিনাকুমারীর কাছে পাঠিয়ে দেয়।

শিউচন্দ্রিকার চিঠি পেয়ে মিনাকুমারী নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। অভিমন্যুকে লেখা তার দুই ছত্রের চিঠি পড়ে ফিরে আসে প্রবল ভালোবাসা। সে অনুধাবন করতে পারে মিল-কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্র। মিনাকুমারী ধারণা করে, তার উপেক্ষা সহ্য করতে না পেরে অভিমন্যু বলীরামপুর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। অনুশোচনায় দগ্ধ মিনাকুমারী অভিমন্যুর মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করে। সে ছুটে যায় দীক্ষিতদের আমবাগানে, যেখানে একদিন অভিমন্যুর সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়েছিল। ঔপন্যাসিক সতীনাথ ব্যঞ্জনাপূর্ণ আবেগদীপ্ত ভাষায় মিনাকুমারীর জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলির বর্ণনা দিয়েছেন :

> দীক্ষিতদের আম-বাগান এক দুর্বার আকর্ষণে তাকে টানছে। মৃগনাভির গন্ধ লক্ষ করে পাগল হয়ে মৃগী ছুটেছে। আম-বাগানের দিক থেকে কনকনে পশ্চিমে হাওয়া লাগছে তার সর্বাঙ্গে। গলায় পাক দিয়ে জড়ানো স্কার্ফটার প্রান্তদুটো এই হাওয়াতে উড়ছে। সেই আম-গাছটায় মুকুলভরা নিচু ডালটা দুলে দুলে উঠছে। ডাকছে তাকে হাতছানি দিয়ে। এখানেই সে আজ ফিরে পারে তার অভিমন্যুকে। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২১৮)

মিনাকুমারীর এই আত্মহননের মধ্য দিয়ে একটি অসম্পূর্ণ ভালোবাসার ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছে। *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসে 'মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, শ্রমিক জীবনের বিশ্বস্ত ছবি, শ্রমিকদের লড়াই– সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে ব্যক্তিমানুষের নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্বের অন্বেষণ' (পিনাকেশ, ২০০৬ : ৮৬)। শ্রমিকনেতা শিউচন্দ্রিকা প্রচলিত নেতৃচরিত্র মাত্র নয়। তার মধ্যেও রয়েছে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব– বিশেষত বন্ধু অভিমন্যুকে নিয়ে প্রথমাবধি সে ছিল অনিশ্চিত ও দ্বিধাগ্রস্ত। অভিমন্যু তার প্রাণের বন্ধুর কাছে প্রায় সব ব্যাপারে অকপট হলেও ভালোবাসার জগতে একা, নিঃসঙ্গ; এমনকি তার প্রণয়পাত্রী মিনাকুমারীকেও সে সব কথা খুলে বলতে পারেনি। মিনাকুমারীও তার গোপন ভালোবাসা প্রচ্ছন্ন রেখেছে অব্যক্ত বেদনায়, শেষ পর্যন্ত তার মাসুল দিয়েছে আত্মহত্যা করে।

চিত্রগুপ্তের হিসেব-ছকটিকে এভাবেই মিলিয়ে নেন লেখক। চিত্রগুপ্তকে নিয়ে উপন্যাসের প্রারম্ভে যে অভিপ্রায়টি তাঁর স্থগিত ছিল গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে এসে আবার সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসেন তিনি। পাঠক সমীপে ফিরিয়ে আনেন চিত্রগুপ্তকেও; কিন্তু আনেন ভিন্ন পরিচয়ে, ভিন্ন ভূমিকায় :

> চিত্রগুপ্ত তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক। সাহিত্য-সমালোচনায় পয়সা নাই। সেইজন্য লেটারহেড ছাপিয়ে একটা নতুন ব্যবসা খুলে বসেছেন,– ডাকযোগে গল্প লেখা শেখানো। নূতন লেখকদের লেখার দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া, আর তাঁর বিজ্ঞাপন যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে পনেরটি মাত্র পাঠে পুরোদস্তুর লেখক তৈরি করে দেওয়া– 'ইহাই চিত্রগুপ্ত-বাণী-প্রতিষ্ঠান-এর উদ্দেশ্য। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২১৯)

উপন্যাসে রোমাঞ্চের স্থান নেই জেনেই আখ্যান শেষে লেখক পাঠককে চমকে দিয়ে জানালেন যে মিনাকুমারী-অভিমন্যুর প্রেম-কাহিনি কাল্পনিক। উপন্যাসের শেষে মিলন, বিরহ, স্বাভাবিক

মৃত্যু, আত্মহত্যা, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি পনেরটি সংকেত দিয়ে যশোলিপ্সু উদীয়মান লেখকদের আবেগের বিহ্বলতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। চিত্রগুপ্ত নামের মধ্যেও নিহিত রয়েছে লেখকের বক্রকটাক্ষ।

চিত্রগুপ্ত বলতে পাঠক প্রাথমিকভাবে অনুমান করেন জীবনের নথিরক্ষক চিত্রগুপ্তকে। চিত্রগুপ্তের রহস্যভেদ হয়েছে উপন্যাসের শেষে। হিন্দু পুরাণ মতে, চিত্রগুপ্ত যমের কায়স্থ কর্মচারী, সে মানুষের পাপ-পুণ্যের চিত্র-বিচিত্র হিসাব গুপ্ত রাখে। কিন্তু এই উপন্যাসে চিত্রগুপ্ত হিন্দু পুরাণের দেবতা নয়, মাত্র সাড়ে তিনশ টাকায় পনেরটি পাঠে উপন্যাস রচনার পাঠক্রম সরবরাহকারী স্বনামধারী সমালোচক। এভাবেই চিত্রগুপ্তের মুখোশ উন্মোচন করেন লেখক। জীবনের চালক চিত্রগুপ্তের স্থলে লেখকের সাহিত্য রচনার শিক্ষক চিত্রগুপ্তকে বসানোর ব্যঙ্গ ও শ্লেষের অন্তরালে সক্রিয় থেকেছে লেখকের যুক্তি ও মনন। উপন্যাসটির শেষাংশে 'নতুন লেখকদের' প্রতি চিত্রগুপ্তের 'বিশেষ গোপনীয়' কয়েকটি পরামর্শের উল্লেখ রয়েছে :

(ক) একটি গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক ঘটনা গল্পের ভিতরে ঢুকাইয়া দিবেন।

(খ) খানিকটা রাজনীতি (ফিকে গোছের) গল্পের ভিতর যেন স্থান পায়।

(গ) সাধারণ বুদ্ধিতে অবিশ্বাস বা অসম্ভাব্য মনে হইলেও স্থূল নাটকীয় উপাদান বহুল পরিমাণে গল্পের ভিতর দিতে ভুলিবেন না।

(ঘ) শোষক ও শোষিতের সংঘর্ষের কথা যেমন করিয়া হউক গল্পের ভিতর আনিতে চেষ্টা করিবেন। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২২০)

কোনো নাম-পরিচয় দ্বারা চিহ্নিত না হলেও এই অনুচ্ছেদটি ঘটনা প্রসঙ্গ বহির্ভূত স্বতন্ত্র এক পরিশিষ্ট। সাহিত্যে বিশেষ ধারা রচনার লক্ষ্যেই হয়তো লেখকের এই সকৌতুক কটাক্ষপাত। 'চিত্রগুপ্ত' প্রসঙ্গে রহস্যময়তা সৃষ্টির মাধ্যমে সতীনাথের বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক মন সম্ভবত একটু কৌতুক করতে চেয়েছিল পাঠকের সঙ্গে। সতীনাথ নিজে মিনাকুমারীর চিঠি, নায়কের মৃত্যু সম্পর্কে জ্যোতিষীর গণনা, নায়কের মৃত্যু, নায়িকার আত্মহত্যা ছাড়াও লেখার জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্য সমসাময়িক ঘটনা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, শাসক-শোষিতের বিরোধ সবকিছুর সমন্বয়ে ব্যঙ্গ-শ্লেষের মাধ্যমে সময়, সমাজ ও রাজনীতির দ্বন্দ্বে আলোড়িত ব্যক্তির অন্তর্লীন সংকটকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। সতীনাথ বুঝতে পেরেছেন স্বাধীনতার পর লাডলীবাবু, বলিরাম জুটমিলের মালিকরা ক্ষমতাবান হয়েছে। আর ঢোঁড়াই, অভিমন্যু প্রভৃতি সাধারণ মানুষ হয়েছে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার। *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসে সতীনাথের নিজের মনের দ্বন্দ্ব আরও পরিষ্কার হয়েছে। তাই প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে তিনি খুঁজে নিয়েছেন সত্যান্বেষণের পথ।

জাগরী ও *ঢোঁড়াই চরিতমানসের* মতো *চিত্রগুপ্তের ফাইল*ও সতীনাথ ভাদুড়ীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ফসল। রাজনৈতিক আদর্শ ও ব্যক্তিগত আবেগের দ্বন্দ্ব এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। শেষের চমকের চেয়ে আদর্শের ট্র্যাজিক পরিণতি পাঠকের চিত্তকে অধিকতর অভিভূত করে। উপন্যাসটি মোট আটটি তরঙ্গে বিভক্ত। কাহিনি শুরু হয়েছে প্রথম পুরুষে, তারপর ধীরে ধীরে প্রথম তরঙ্গেই শিউচন্দ্রিকার দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন লেখক। উপন্যাসটিতে কাহিনি বর্ণনায় ফ্ল্যাশ-ব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে শিউচন্দ্রিকার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠা টুকরো টুকরো দৃশ্য প্রধান্য পেয়েছে। শ্মশানে অভিমন্যুর খদ্দরের ঝোলা ও চিঠির অনুষঙ্গে শিউচন্দ্রিকার চোখের সামনে ঘটনাগুলো ভেসে উঠেছে। কেবল মিনাকুমারী

ও অভিমন্যুর পরস্পরকে লেখা চিঠি দুটির ক্ষেত্রে মিনাকুমারী ও অভিমন্যুর দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনি বিবৃত হয়েছে। শেষ তরঙ্গে এসে লেখক 'চিত্রগুপ্ত' ছদ্মনামধারী লেখকের জবানীতে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। একজন শ্রমিক নেতা ও মালিক পক্ষের অনুগৃহীত কর্মীর প্রেম কীভাবে মালিক পক্ষের ঘৃণ্য কূটচালে রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে তলিয়ে গেল– এরূপ মর্মন্তুদ বিয়োগান্তক কাহিনিই এই উপন্যাসের অবলম্বন।

ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাসে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে চিত্রগুপ্তের খসড়া ও শিউচন্দ্রিকার বর্ণনা এই দুটি স্তরে কাহিনির বিস্তার ঘটেছে। এখানে লেখক এক নতুন কৌশলে কাহিনির শুরু ও শেষকে একই বিন্দুতে বেঁধে দিয়েছেন। কাহিনিকে নিজের পথে চালিত করে আবার শুরুর মুহূর্তে ফিরিয়ে এনেছেন। কাহিনির প্রারম্ভে চিত্রগুপ্ত ফাইল খুলে নায়িকা মিনাকুমারীর জন্য অপঘাত-মৃত্যুর পরিণতি নির্দেশ করেছেন। তারপর কীভাবে মিনাকুমারীর জীবন সেই পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে সেটা শিউচন্দ্রিকার চিন্তাসূত্র ধরে বিবৃত করেছেন। একেবারে শেষে মিনাকুমারীর আত্মহত্যার দৃশ্যের পরেই জানা গেল যে এই 'চিত্রগুপ্ত' যমরাজের হিসাবরক্ষক নন, তিনি আসলে উদীয়মান লেখকের 'করেসপন্ডেন্স কোর্সের পরিচালক'। তারপর মিনাকুমারীর পরিণতির বর্ণনা চিত্রগুপ্ত নিজেই দিয়েছেন। কাহিনির শেষ দৃশ্যকে প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার এই কৌশল অবলম্বনের পেছনে কাজ করেছে লেখকের সব্যঙ্গ হাস্যের মনোভাব। লেখকের বর্ণনা কৌশলে পাঠক যখন গল্পের বিয়োগান্তক পরিণতির সঙ্গে একান্ত হয়ে পড়েছে, মিনাকুমারী-অভিমন্যুর বেদনাদায়ক পরিণতির শোকে মুহ্যমান– ঠিক তখনই লেখক সচেতন পাঠককে নিক্ষেপ করেন বাস্তবতার ভূমিতে। পাঠক অবাক হয়ে লক্ষ করেছে চিত্রগুপ্ত গল্পের কথকমাত্র। পাঠক যেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল সেটা যে আসলে ছকে বাঁধা কল্পকাহিনি মাত্র– এটা বুঝে পাঠক নিজের নির্বুদ্ধিতায় বিমূঢ় হয়েছে। লেখকের এই কৌশল অবলম্বনের কারণ নিছক চমক সৃষ্টি করা নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন প্রত্যক্ষ সংগ্রামী হিসেবে তাঁর এবং অসংখ্য মানুষের যে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, পাঠকের স্বপ্নভঙ্গের মধ্যে তা-ই যেন আভাসিত হয়েছে।

চিত্রগুপ্তের ফাইল উপন্যাসে অভিনব কৌশলে সময়-বিন্যাসের মাধ্যমে কাহিনিতে নাটকীয়তা সঞ্চার করেছেন লেখক। প্রথম স্তরে আপাত সময় কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী। ছদ্মনামধারী লেখক চিত্রগুপ্ত ফাইল খুলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গোছাতে গোছোতে তার এক শিক্ষানবিশ গ্রাহককে গল্পের প্লট সরবরাহ করছেন। এই স্তরে বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে 'চিত্রগুপ্তের' সরবরাহকৃত ঘটনার বর্ণনায় প্রকৃত সময় প্রায় বার দিনের। কেবল প্রথম ও শেষ দিনের ঘটনার সময় উল্লেখ করা আছে। উপন্যাসের শুরুতে প্রথম তরঙ্গে রয়েছে অভিমন্যুর শবদাহের সময়– ৩১/০১/১৯৪৮-এর সন্ধ্যা এবং উপন্যাসের সপ্তম তরঙ্গে চিত্রগুপ্তের প্রসঙ্গে ফিরে যাবার আগেই অভিমন্যুর মৃত্যুর তের দিনের মাথায় মিনাকুমারীর আত্মহত্যার ঘটনা ১২/০২/১৯৪৮ সন্ধ্যা। এই স্তরে কালের ব্যবহার সাধারণ বর্তমান। তৃতীয় স্তর– এই দুই সময় সীমার মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে মিনাকুমারী-অভিমন্যু ও শিউচন্দ্রিকার জীবনের অতীত দুই বছরের ধারাবাহিক ঘটনার বর্ণনা। স্মৃতিচারণার সময়ে বর্তমান কালের ব্যবহার হয়েছে। এই উপন্যাসে অভিনব কাহিনি-বিন্যাস কালের বিন্যাসকে প্রভাবিত করেছে।

চিত্রগুপ্তের ফাইল উপন্যাসে দুটি বিষয় সমান্তরালে এগিয়ে গেছে– একটি মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের রাজনৈতিক বিষয় এবং অন্যটি অভিমন্যু-মিনাকুমারীর প্রেমের চিত্র। লেখক তাঁর ভাষা ব্যবহারের কৌশলে দুটি ভিন্ন বিষয়ের আন্তরিক স্বাদ পাঠককে দিতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রমিক ইউনিয়নের আন্দোলন ব্যর্থ করে দেবার জন্য মালিকপক্ষের ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ভাষারূপ গড়ে তুলেছেন লেখক :

> দালালদের দিয়ে আর একটা লোক-দেখানো ইউনিয়ন খোলবার চেষ্টা করছে জয়নারায়ণ প্রসাদ, এই বলে দিলাম। তোমরা যদি নিজেদের ইউনিয়নের চাঁদা দেওয়া মেম্বার না হও তাহলে একদিন কালেক্টর সাহেবকে দিয়ে বলিয়ে দেবে ম্যাকলীন সাহেব যে, ঐ দালাল ইউনিয়নটারই মেম্বার বেশি– সেইটাই আসল ইউনিয়ন। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২১৫)

বর্ণনার গুণে 'বকাশ্‌ৎ' আন্দোলনের পটভূমিকায় শুধু শ্রমিক ইউনিয়ন নয়, কৃষক শোষণের ছবিও ফুটে উঠেছে :

> এ পাঁচ মাস অযোধিয়া চৌধুরীর লেঠেলরা লাঠিতে তেল দিতে ভোলেনি। অযোধিয়া চৌধুরী নিজে মঘৈলী থানার দারোগা সাহেবকে ভেট পাঠাতে ভোলেননি একদিনও। পুলিশ নিমকহারাম নয়, যার নুন খায় তার গুণ গায়। সেই ভরসাতেই অযোধিয়া চৌধুরী জমি থেকে বেদখল করতে সাহস করেছে অগণিত রায়তদের। যারা বংশ পরম্পরায় এই জমিতে অশ্রু ঘামের রস জুগিয়ে এসেছে, নির্মম হাতে তাদের উপড়ে ফেলে দিতে চায় শিরনিয়ার জমিদার বাবু, স্বাধীন ভারতের রসের মধু যেন সে শিকড় না পায়। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২৩৮)

জমিদারের লোভ ও আগ্রাসী মনোভাব এই কয়েকটি বাক্যের মধ্যে স্পষ্টতর হয়েছে। 'লেঠেল', 'রায়ত', 'বেদখল', 'জমিদার বাবু' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার কৃষক-শোষণের অনুষঙ্গ নিয়ে এসেছে। 'অশ্রু ও ঘামের রস', 'উপড়ে ফেলা', 'রসের মধু', 'শিকড়' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার পাঠকের আবেগকে নাড়িয়ে দিয়ে কৃষকের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। 'যার নুন খায় তার গুণ গায়'– প্রবাদের ব্যবহার ভাষায় যথেষ্ট ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। জনগণের টাকায় যে পুলিশ ও আমলা বাহিনীকে পোষা হয় তারা জনগণের প্রতি নয়, জমিদারের প্রতি অনুগত।

অন্যদিকে শ্রমিকনেতা অভিমন্যুর কল্পনাপ্রবণ মন যখন মিনাকুমারীকে পেতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে, সেরূপ রোমান্টিক অনুষঙ্গের ভাষা নিম্নরূপ :

> পক্ষীরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে যে রাজপুত্তুর মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলে, তার কি মাটিতে হোঁচট খাওয়ার কথা মনে আসে? মনের নদীতে বান ডেকেছে; দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যাবেই যাবে। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২১৪)

এখানে 'পক্ষীরাজ', 'রাজপুত্তুর', 'মেঘের মধ্য দিয়ে উড়ে চলা' প্রভৃতি শব্দবন্ধ শ্রমিক সংগঠনের নেতার রোমান্টিক মনের ঢাকনা খুলে দিয়েছে। 'নদীতে বান ডাকা' উপমার ব্যবহারে অভিমন্যুর জীবনের বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে। 'বান' শব্দটি একই সঙ্গে দুরন্ত ও ধ্বংসের ইঙ্গিতবাহী। মিনাকুমারী সম্বন্ধে তার প্রবল আবেগ জীবনকে অনিবার্য ভাদুড়ী চরিত্র ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারে ও শব্দ প্রয়োগে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। জীবনের পথে সতর্ক পথিক মিনাকুমারী। কিন্তু দীক্ষিতদের আম বাগানের এক বসন্ত-গোধূলি ও অভিমন্যুর সংস্পর্শ তার চিত্তের সতর্ক প্রহরাকে শিথিল করে দিয়েছে। ঐ সন্ধ্যার অনুভব তার সমস্ত হিসেবের বাইরে। মিনাকুমারীর ঐ বেহিসেবি অনুভূতিকে বিশেষ শব্দের প্রয়োগে লেখক স্পষ্ট করেছেন–

'যে তার সম্পর্কে আসে তারই উপর অভিমন্যুর মন হালকা পরশ রেখে যায়! মিনাকুমারীর উপর রঙের পরশ এত হালকাভাবে লাগেনি' (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২১৪)। এখানে 'স্পর্শ' শব্দের স্বরভক্তি ঘটিয়ে লেখক অভিমন্যু ও মিনাকুমারীর প্রেমের উন্মেষের স্পর্শকাতরতাকে সঠিক মাত্রা দেবার চেষ্টা করেছেন। অনাথ আশ্রমের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন :

> বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একখানি নিকানো অঙ্গন; উঠোনের তুলসী মঞ্চটার পাশে একটা উলঙ্গ শিশু খেলা করছে। এই অঙ্গনটা হবে তার একান্ত আপন; নিজেকে নিঃশেষ করা দরদ দিয়ে সে গড়ে তুলবে এই নীড়। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২১৩)

অনাথালয়ে বেড়ে ওঠা মিনাকুমারী নিরাপদ ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখে 'বেড়া দিয়ে ঘেরা' এই শব্দবন্ধ সেই নিরাপত্তার প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'ছোট্ট নিকানো অঙ্গন', 'তুলসীমঞ্চ', 'উলঙ্গ শিশু', 'একান্ত আপন', 'নিঃশেষ করা দরদ' প্রভৃতি শব্দবন্ধের প্রয়োগের মাধ্যমে লেখক সেই নিরাপদ জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবতার রঙে রাঙিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ও রাজনৈতিক কর্মীর প্রেম-প্রসঙ্গ এক সাথে গাঁথা হওয়ায় *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসে নানারূপ বাক্‌প্রতিমার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। অভিমন্যু-মিনাকুমারীর প্রেমানুষঙ্গে উপমার প্রয়োগ কাহিনিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। যেমন :

১. বিচ্ছিন্ন চিন্তার টুকরোগুলোও শুকনো পাতার মতো মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যে উড়ে চলে যায়, যে ঝড় মনের মধ্যে দিয়ে বইছে তারই ঝাপটায়। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৯০)

২. গ্লানির অন্ধকার হঠাৎ ঢেকে ফেলেছে বলীরামপুরের নিরর্থক জগৎটাকে। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২৫৭)

৩. চিঠির ছত্রগুলো জাঁতার মতো পিষে ফেলেছে মিনাকুমারীকে। এক একটা কথা তো নয়, যেন কারখানার দাঁতওয়ালা চাকার এক একটা দাঁত। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২৫৬)

কাব্যিক সুষমামণ্ডিত উপমার কোনোটি বিশেষ একটি অনুভূতির আবেদনেই সীমাবদ্ধ, এছাড়াও অনেক উপমার আবেদন পাঠকের গভীরতর অনুভূতির জগতে।

অভিমন্যুর চিতাকে ঘিরে বসে থাকা নিকটজনেরা ভাবছে তাদের জ্ঞানের জগতে অভিমন্যুর মনের যে দিকটি অনালোকিত ছিল, তা আলোকিত হয়ে উঠেছে অভিমন্যুর মৃত্যুতে। অভিমন্যু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে জগতে পৌঁছে গেছে তা তাদের কাছে অগম্য। চিতার পাশে বসে তারা অভিমন্যুর জন্য তাদের দায়িত্ব নির্ণয় করছে। অভিমন্যু মৃত্যুর ওপারে পৌঁছেও তাদের চেতনায় সত্য হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিকের বিবরণ নিম্নরূপ :

> কালো জলে চিতার আগুনের আলো পড়ছে; বৈতরণীর উপর গড়ে উঠেছে গলানো সোনার সেতু। চারিদিকে অগণিত লোকের মেলা। নির্বাক নিশ্চল জনতার ভিড়টা চিতার তিন দিকে জমে চাপ বেঁধে গিয়েছে। একটা ছোট্ট দলের মধ্য থেকে ভেসে আসছে রামধুনের গান, শোকাতুর লোকগুলোর তার সঙ্গে ক্ষীণ সুরের যোগান দেওয়ারও উৎসাহ নেই। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৮৯)

চিত্রগুপ্তের ফাইল একটি সংকটময় সময়ে রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির পারস্পরিক সংঘাতময় সম্পর্কের দলিল। রাজনৈতিক দল শৃঙ্খলা রক্ষার নামে ব্যক্তিজীবনের স্বাধীন সত্তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে– এমন প্রসঙ্গ নিয়ে উপন্যাস রচনা সতীনাথ ভাদুড়ীর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে বিরল।

মালিকপক্ষের শোষণ বা শ্রমিকদের লড়াই– এসব ছাপিয়ে উঠেছে ব্যক্তি-মানুষের নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্বের অন্বেষণ। চরিত্রকল্পনা ও কাহিনি-সংস্থানের নিজস্ব ভঙ্গিমায় লেখক সচেতনভাবেই ব্যক্তির সংকটকে একটি সার্বিক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ওপরে স্থান দিয়েছেন। মিল কর্তৃপক্ষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে লেখকের নির্মমতা ও কুশলতা তাঁর মানবপ্রেমিক হৃদয়েরই উজ্জ্বল প্রমাণ। ব্যক্তির চরিত্রহনন, তাদের ওপর নেমে আসা কুৎসিত কলঙ্কের ভার কিংবা শ্রমিকশ্রেণির ন্যায্য দাবির বিপরীতে নেমে আসা নিষ্পেষণের চিত্র রূপায়ণে তথা পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকের যথাযথ উপস্থাপনে লেখকের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। ব্যক্তি ও রাজনীতির অসম দ্বৈরথে স্বাধীনতা-উত্তরকালে শ্রমিক-আন্দোলনের পরিবেশ ও সংকটের বিশ্বস্ত দলিল হিসেবেও *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসটি তাৎপর্যপূর্ণ।

সহায়কপঞ্জি

পিনাকেশ সরকার (২০০৬)। 'সম্পর্ক ও নিঃসম্পর্কতার আখ্যান : চিত্রগুপ্তের ফাইল'। *কোরক* (সতীনাথ সংখ্যা), সম্পাদক : তাপস ভৌমিক, কলকাতা।

ভবানী সরকার (২০০৬)। 'সতীনাথ ও তাঁর উপন্যাস *চিত্রগুপ্তের ফাইল*'। *দিবারাত্রির কাব্য* (সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা), সম্পাদক : আফিফ ফুয়াদ, কলকাতা।

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৪১৮)। *সতীনাথ রচনাবলী* ২, (সম্পাদক : শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

সতীনাথ ভাদুড়ী (২০১২)। 'ঢোঁড়াই'। *পড়ুয়ার নোট ও অন্যান্য*। মনফকিরা, কলকাতা।

স্বস্তি মণ্ডল (২০১০)। *সতীনাথ ভাদুড়ী*। সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা।